অন্নদামঙ্গল

অন্নদামঙ্গল রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র রচিত একটি মঙ্গলকাব্য। কাব্যটি দেবী অন্নপূর্ণার মাহাত্ম্যব্যঞ্জক। ১৭৫২ খ্রিষ্টাব্দে ভারতচন্দ্র এই কাব্য রচনা করেছিলেন। ভারতচন্দ্রের পৃষ্ঠপোষক নদিয়ারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় বাংলায় প্রতিমায় দেবী অন্নপূর্ণার পূজা প্রচলন করেন। তিনিই ভারতচন্দ্রকে রায়গুণাকর উপাধি প্রদান করে দেবীর মাহাত্ম্যব্যঞ্জক একটি কাব্য রচনার অণুরোধ করেন। সমগ্র কাব্যটি তিনটি খণ্ডে বিভক্ত: (ক) অন্নদামঙ্গল বা অন্নদামাহাত্ম্য, (খ) বিদ্যাসুন্দর বা কালিকামঙ্গল ও (গ) মানসিংহ বা অন্নপূর্ণামঙ্গল। মঙ্গলকাব্য ধারায় অন্নদামঙ্গল কাব্যকে একটি পৃথক শাখা রূপে গণ্য করা হয় না; কারণ ভারতচন্দ্র ভিন্ন অপর কোনো কবি এই বিষয়বস্তু অবলম্বন করে কাব্যরচনা করেননি।

সমগ্র অন্নদামঙ্গল কাব্যের কোনো প্রাচীন নির্ভরযোগ্য পুথি পাওয়া যায় না। প্রাপ্ত পুথিগুলির লিপিকাল ১৭৭৬-১৮২৯ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়। ১৮১৬ খ্রিষ্টাব্দে এই কাব্যটি প্রথম মুদ্রিত হয়। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ১৮৪৭ ও ১৮৫৩ সালে এই গ্রন্থের দুটি সংস্করণ প্রকাশ করেন। পরবর্তীকালে বিদ্যাসাগর কৃত সংস্করণটি আদর্শ ধরে অন্নদামঙ্গল কাব্যের অন্যান্য সংস্করণগুলি প্রকাশিত হয়। লন্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়াম, প্যারিসের বিবলিওথেক নাসিওনেল দে ফ্রান্স, এশিয়াটিক সোসাইটি ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে এই কাব্যের কয়েকটি প্রাচীন পুথি সংরক্ষিত আছে।

ভারতচন্দ্র স্বয়ং অন্নদামঙ্গল কাব্যকে "নূতন মঙ্গল" অভিধায় অভিহিত করেছেন। কবি এই কাব্যে প্রথাসিদ্ধ মঙ্গলকাব্য ধারার পূর্ব ঐতিহ্য ও আঙ্গিককে অনুসরণ করলেও, বিষয়বস্তুর অবতারণায় কিছু নতুনত্বের নিদর্শন রেখেছেন। অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের ন্যায় অন্নদামঙ্গল গ্রামীণ পটভূমি বা পরিবেশে রচিত হয়নি; এই কাব্য একান্তই রাজসভার কাব্য। ভারতচন্দ্র এই কাব্যের আখ্যানবস্তু সংগ্রহ করেছিলেন কাশীখণ্ড উপপুরাণ, মার্কণ্ডেয় পুরাণ, ভাগবত পুরাণ, বিহ্লনের চৌরপঞ্চাশিকা (চৌরীসুরত পঞ্চাশিকা), এবং ক্ষিতীশবংশাবলীচরিতম্ ইত্যাদি গ্রন্থ ও লোকপ্রচলিত জনশ্রুতি থেকে। অন্নদামঙ্গল কাব্যের বৈশিষ্ট্য হল ছন্দ ও অলংকারের সুদক্ষ প্রয়োগ। সংস্কৃত ভাষায় পারঙ্গম ভারতচন্দ্র প্রাচীন সংস্কৃত কাব্যের বিভিন্ন ছন্দ ও অলংকার সার্থকভাবে এই কাব্যে প্রয়োগ করেন। এই কারণে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই কাব্য সম্পর্কে মন্তব্য করেন,

> “রাজসভাকবি রায়গুণাকরের অন্নদামঙ্গল-গান রাজকণ্ঠের মণিমালার মতো, যেমন তাহার উজ্জ্বলতা তেমনি তাহার কারুকার্য।”

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে:

> “অন্নদামঙ্গলকাব্য অষ্টাদশ শতাব্দীর সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্য, সমগ্র বাংলা সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের অন্যতম। ... মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র কর্তৃক অন্নপূর্ণা পূজা উপলক্ষে মহারাজের নিজ কীর্তি এবং তাঁহার পূর্বপুরুষ ভবানন্দ মজুমদারের রাজ্য ও রাজা উপাধি লাভের কাহিনী বর্ণনাই ছিল কবির প্রধান উদ্দেশ্য। দেবী অন্নদা (অন্নপূর্ণা) কীভাবে ভবানন্দ মজুমদারকে কৃপা করিলেন, এবং ভবানন্দ কীভাবে জাহাঙ্গীরের দ্বারা অন্নপূর্ণা পূজা করাইয়া রাজত্ব ও রাজা খেতাব লাভ করিলেন – ইহার বর্ণনাই ছিল কবির প্রচ্ছন্ন উদ্দেশ্য। কিন্তু কবি পৌরাণিক অংশ বিশেষ ফলাও করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।”

কাব্যের বিষয়বস্তু

অন্নদামঙ্গল কাব্য তিনটি খন্ড নিয়ে গঠিত। এগুলি হল - ১. অন্নদামঙ্গল , ২. কালিকামঙ্গল বা বিদ্যাসুন্দর কাব্য এবং ৩. মানসিংহ।

অন্যান্য মঙ্গলকাব্য এর মত ১ম খন্ড অন্নদামঙ্গলে দেবী অন্নদার মাহাত্ব্য বর্নিত হয়েছে। সতীর দেহত্যাগ ,শিব-পার্বতীর বিবাহ প্রভৃতি পৌরাণিক কাহিনী খন্ডের প্রথমে বলা হয়েছে। এরপরে বসুন্ধর ও নলকুবেরের হরিহোড় ও ভবানন্দ মজুমদার রুপে মর্তে আগমন , দেবীর হরিহোড়ের গৃহে প্রবেশ , এরপর দেবীর হরিহোড়ের গৃহত্যাগ ও ভবানন্দের গৃহে আগমন প্রভৃতি কাহিনী বর্নীত হয়েছে।

২য় খন্ড বিদ্যাসুন্দরের সঙ্গে মূল কাহিনীর কোনো সম্পর্ক নেই। এখানে বর্ধমানের রাজকন্যা বিদ্যা ও কাঞ্চীর রাজকুমার সুন্দর এর প্রেমকাহিনী বর্নীত হয়েছে। এই খন্ডে দেবী কালিকার মাহাত্ব্য প্রচারিত হয়েছে।

৩য় খন্ডে মানসিংহ , ভবানন্দ মজুমদার , প্রতাপাদিত্যের কাহিনী আছে।

আলোচনা

অন্নদামঙ্গল কাব্যকে ভারতচন্দ্র নূতন মঙ্গল বলেছেন। ত্রয়োদশ শতক থেকে অষ্টাদশ শতকের মধ্যে রচিত মঙ্গলকাব্য গুলির থেকে অন্নদামঙ্গল কাব্য তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের জন্য স্বতন্ত্রতা লাভ করেছে। মঙ্গলকাব্য গুলির মত দেবদেবীর মাহাত্ম্য প্রচারের সঙ্গে সঙ্গেই ভবানন্দ মজুমদারের মাহাত্ম্যও প্রচারিত হয়েছে।

সমগ্র কাব্যের মধ্যে প্রথম খন্ডটিই সর্বোৎকৃষ্ট। ভাষা - ছন্দ- অলঙ্কারের ব্যবহার কৌশলে ভারতচন্দ্র মধ্যযুগের সকল কবিকে ছাড়িয়ে গেছেন। তাঁর কাব্যের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল সুস্পস্ট সমাজচিত্র অঙ্কন।

প্রথম সচিত্র গ্রন্থ

১৭৭৮ খ্রিষ্টাব্দে মুদ্রাঙ্কিত অর্থাৎ প্রেসে ছাপা প্রথম বাংলা বই প্রকাশিত হয়। এর বহু পরে প্রকাশিত হয় 'অন্নদামঙ্গল', ১৮১৬ খ্রিষ্টাব্দে। এটি বাংলা ভাষার প্রথম সচিত্র গ্রন্থ। বাঙালি শিল্পীদের আঁকা ৬টি ছবি এই গ্রন্থের সচিত্রকরণে ব্যবহৃত হয়েছিল।

ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর: অষ্টাদশ শতকের শ্রেষ্ঠ কবি

যে সকল অসাধারণ প্রতিভাধর কবি-সাহিত্যিকদের হাত ধরে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য আজ এত উন্নত ও সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে, তাদের মধ্যে নিঃসন্দেহে 'ভারতচন্দ্র রায়' নামটি বিশেষভাবে স্মর্তব্য। ভারতচন্দ্র রায় তাঁর অসাধারণ লেখনী ও কাব্যপ্রতিভাগুণে হয়ে উঠেছেন বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। তাঁর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের পরিসমাপ্তি ঘটে। তিনি এমনই মহান এক কবি, যাঁকে হারিয়ে বাংলা সাহিত্যে এক দীর্ঘস্থায়ী বন্ধ্যাত্বের সূচনা হয়। কিন্তু আমাদের অনেকেই এই নামটি হয়তো আগে কখনোই শুনিনি। কিংবা যারা শুনেছেন, তারাও তার পরিচয় বা লেখনী সম্বন্ধে বিশেষ কিছু মালুম নন। আজকের লেখায় বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের অষ্টাদশ শতকের যুগশ্রেষ্ঠ এই কবির জীবন ও কর্ম সম্বন্ধে খানিকটা আলোকপাত করা হবে।

জন্ম ও বংশ পরিচয়

মধ্যযুগের সর্বশেষ কবি হলেন ভারতচন্দ্র রায়। তাঁর পিতার নাম নরেন্দ্রনারায়ণ রায় (মুখার্জি)। জানা যায়, নরেন্দ্রনারায়ণ রায় ছিলেন জমিদার। মায়ের নাম ভবাণি দেবী। চার সন্তানের মধ্যে ভারতচন্দ্র ছিলেন সবার ছোট। তাঁর জন্মসাল সুনিশ্চিতভাবে জানা যায় না। তবে, বিখ্যাত কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বলেছেন, তিনি ১৭১২ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেছেন। জন্মস্থান নিয়েও গবেষকদের মধে দ্বিমত আছে। কেউ বলেন, তিনি ভরসুর পেড়ো গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছেন। আর কেউ বলেন, তিনি হাওড়া জেলার পাণ্ডুয়া বা পেন্ড্রো গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছেন। তবে দ্বিতীয় মতটিই বেশিরভাগ গবেষক গ্রহণ করেছেন। সে যা-ই হোক, ভারতচন্দ্র তো তাঁর কীর্তির মাধ্যমেই আমাদের কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

পারিবারিক ইতিহাস

আগেই বলেছি, ভারতচন্দ্রের পিতা ছিলেন জমিদার। ফলে, সমাজে তারা ছিলেন বেশ সম্মানিত। লোকেরা তাঁদেরকে রাজা বলেই সম্বোধন করতো। তবে, সবার জীবনেই উত্থান-পতন আছে। শোনা যায়, ভারতচন্দ্রের পিতা নরেন্দ্রনারায়ণের সাথে বর্ধমানের মহারানীর কোনো এক বিষয়ে মতদ্বৈততা হয়। এতে রানী তাঁর উপর নাখোশ হয়ে পাণ্ডুয়ার সেই রাজপ্রাসাদটি জবরদখল করেন। এ অবস্থায় নরেন্দ্রনারায়ণ বেশ অভাব অনটনে পড়ে যান। আর উঠে দাঁড়াতে পারেননি। জীবিকার তাগিদে কিংবা রাজরোষ থেকে বাঁচতে ভারতচন্দ্র চলে যান তাজপুরে। আশ্রয় নেন মামাবাড়িতে।

বাল্যশিক্ষা

মামার বাড়িতে মোটামুটি ভালোই চলছিলো। এখানে এসে ভারতচন্দ্র সংস্কৃত ভাষা অধ্যয়ন করেন এবং বেশ ভালো ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। পরিণত বয়সে এখানেই তিনি নরোত্তম আচার্যের কন্যাকে বিয়ে করেন। ভারতচন্দ্র সংস্কৃতে খুবই দক্ষ ছিলেন। কিন্তু কেবল সংস্কৃত ভাষা দিয়ে তখন ভালো চাকরি জোটানো সম্ভব ছিল না। বড়জোর ধর্ম-কর্ম, আর দু-চারটে কবিতা লেখার কাজে সংস্কৃত ভাষা কাজে আসতো। তখন চলছিলো মুঘলদের শাসনামল। চারদিকে ফারসি ভাষার প্রাধান্য। সরকারি চাকরিতে উচ্চপদ পেতে ফারসি ভাষায় দক্ষ হওয়াটা আবশ্যক ছিলো। এ লক্ষ্যেই ভারতচন্দ্র ফারসি ভাষা শিখতে আগ্রহী হন। হুগলি জেলার দেবানন্দপুর গ্রামের রামচন্দ্র মুন্সীর কাছ থেকে ফারসি ভাষা রপ্ত করেন। তবে, এ ভাষা শিখতে বেশ বেগ পোহাতে হয়। তবে রামচন্দ্রের বাড়িতে থেকে তার খোরপোষেই বেশ ভালোভাবে ফারসি ভাষা

আয়ত্ত্ব করেন ভারতচন্দ্র।

প্রথম কবিতা রচনা

রামচন্দ্র মুন্সির বাড়িতে থাকাকালীন ১৭৩৭ সনে দেবতা সত্যনারায়ণের পূজা আয়োজন করা হয়। সে উপলক্ষে ভারতচন্দ্র লিখে ফেলেন একটি পাঁচালি। এ পাঁচালি শুনে তো সবাই বেজায় খুশি। হীরারাম রায় নামে এক ভক্ত তাঁকে খুব করে ধরলেন, সত্যনারায়ণপূজা উপলক্ষে কেবল পাঁচালি লিখলেই হবে না, বরং স্বয়ং সত্যনারায়ণ দেবতাকে নিয়েই একটি সম্পূর্ণ পাঁচালি লিখতে হবে! তাই ভারতচন্দ্র লিখে ফেললেন আরো একটি পাঁচালি। কবি জীবনের সূচনাতে রচিত এ দুটি পাঁচালিতে তাঁর কাব্যগুণের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি বাংলায় রচিত এসব কবিতায় বেশ সাবলীলভাবে ফারসি ও উর্দু শব্দ ব্যবহার করেন। এই পাঁচালিগুলো জনপ্রিয় হতে থাকে ক্রমেই আর তিনিও ফারসি পণ্ডিত হিসেবে খ্যাতি লাভ করতে থাকেন।

কারাবাস যাপন

ফারসি শেখা শেষ হলে ভারতচন্দ্র মোক্তার পেশা গ্রহণ করেন। এবার তাঁর স্বদেশ ফেরার পালা। আত্মীয়দের পরামর্শে তিনি জন্মভূমি বর্ধমানে যান। বর্ধমানের মহারাজার কাছ থেকে ভারতচন্দ্রের বাবা নরেন্দ্রনারায়ণ কিছু জমি লীজ নিয়েছিলেন। ভারতচন্দ্র পরে এগুলোর দেখাশোনার দায়িত্ব নেন। সমস্যা বাঁধলো খাজনা পরিশোধ নিয়ে। ভারতচন্দ্রের অন্য ভাইয়েরা সময়মতো এগুলোর খাজনা মহারাজাকে দিতে পারতেন না। মহারাজার উষ্মা পড়ে সেসব জমির তত্ত্বাবধায়ক বেচারা ভারতচন্দ্রের উপর। খাজনা পরিশোধ না করতে পারার জন্য মহারাজা জমিটি খাসভুক্ত করে নেন। আর এদিকে ভারতচন্দ্রকে কারারুদ্ধ করা হয়।

কারাগার থেকে পলায়ন

কারারক্ষীর সাথে ভারতচন্দ্রের ভালো সম্পর্ক ছিলো। তাই তাঁর সহায়তায় ভারতচন্দ্র কৌশলে অল্প কিছু দিন পরেই কারাগার থেকে পালিয়ে যান। মহারাষ্ট্রের উড়িষ্যায় গিয়ে আশ্রয় নেন। উড়িষ্যা রাজ্যের পুরীর স্থানীয় শাসক তাঁকে বসবাসের অনুমতি দেন এবং তাঁর থাকা-খাওয়ারও বন্দোবস্ত করে দেন। এ সময় তিনি একটি মঠে অবস্থান করেন। মঠে থাকাকালীনই তিনি বৈষ্ণবদের সাথে পরিচিত হন। তিনি বৈষ্ণবদের জীবনধারা দ্বারা এতটাই প্রভাবিত হন যে, নিজেই কিছুকাল সন্ন্যাসীদের মতো জীবন যাপন করেন।

কৃষ্ণনগরে অবস্থান ও ‘অন্নদামঙ্গল’ রচনা

সন্ন্যাসী ভারতচন্দ্র সিদ্ধান্ত নিলেন, আর এই পঙ্কিল ধরাধাম নয়, এবার থেকে বৃন্দাবনেই তিনি তাঁর বাকি জীবন পার করবেন। যে-ই কথা, সে-ই কাজ। রওয়ানা করলেন বৃন্দাবনের উদ্দেশে। পথিমধ্যে ভারতচন্দ্র কৃষ্ণনগরের কাছের একটি গ্রাম খানাকুলে কিছুদিন অবস্থান করেন। কারণ, এ গ্রামে থাকতেন তাঁর বোনজামাই। ভারতচন্দ্রের সন্ন্যাসব্রত দেখে তারা তো থ বনে গেলেন। বোন ও ভগ্নিপতি খুব করে বোঝালেন এই সন্ন্যাস জীবন ছেড়ে স্বাভাবিক সংসার জীবনে ফিরে আসতে। কবি এবার চন্দননগর গেলেন, সেখানকার ফরাসি জায়গিরের এক ফরাসি কোম্পানির দেওয়ানের সাথে পরিচিত হন। তাঁর নাম ইন্দ্রনারায়ণ। অল্পকালের মধ্যেই ইন্দ্রনারায়ণের সাথে তাঁর ভাব জমে ওঠে। এই ইন্দ্রনারায়ণ নিজের বিশিষ্ট বন্ধু নবদ্বীপের রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সাথে ভারতচন্দ্রের পরিচয় করিয়ে দেন। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র কবিকে চল্লিশ টাকা মাইনে দিয়ে রাজ সভাসদ হিসেবে নিয়োগ দেন এবং কৃষ্ণনগরে তাঁর থাকবার ব্যবস্থা করে দেন। ভারতচন্দ্র প্রায় সময়ই কবিতা শুনিয়ে মহারাজকে আনন্দ দিতেন। তাঁর পাণ্ডিত্যে ও কাব্য প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র তাঁকে ‘গুণাকর’ মানে ‘সকল গুণের আকর বা আধার’ উপাধিতে ভূষিত করেন। ফলে, ভারতচন্দ্র রায় হয়ে উঠলেন ‘ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর’ ।

একবার কৃষ্ণচন্দ্র রাজা কবিকে সপ্তদশ শতকের এক বিখ্যাত কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তী রচিত ‘চণ্ডীমঙ্গল’ কাব্যের আদলে একখানি কাব্য লিখতে নির্দেশ দেন। কবি ভারতচন্দ্র সোৎসাহে কাব্য লিখতে বসে পড়েন এবং মধ্যযুগের সেই বিখ্যাত কাব্য ‘অন্নদামঙ্গল’ রচনা করে ফেলেন। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র এই কাব্য পড়ে খুবই প্রীত হন। তিনি কবিকে বলেন, এতে বিদ্যাসুন্দরের কাহিনীও জুড়ে দিতে। কবি ভারতচন্দ্র সে আজ্ঞা মেনে নেন। কবি অন্নদামঙ্গল কাব্যে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের পরিবারের একটি কাহিনীও সংযোজন করে দেন। পুরো কাব্যটি নীলমণি দীনদেশাই নামে এক ব্যক্তি কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় সঙ্গীতাকারে পরিবেশন করেন। পুরো আয়োজনটি বেশ উপভোগ্য হয়ে ওঠে সভাময়। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র তাঁর এই মহান সভাকবিকে চব্বিশ পরগণা জেলার মুলাজোরে একটি জমি দান করেন এবং তাঁর জন্য বার্ষিক ছয়শত টাকা হারে সম্মানী নির্ধারণ করে দেন। ভারতচন্দ্র আমৃত্যু সেখানেই বসবাস করেন। তাঁর মৃত্যু হয় ১৭৬০ সালে। তাঁর ছিলো তিন পুত্র- পরীক্ষিৎ, রামতনু ও ভগবান। তাঁর মৃত্যুর মধ্য দিয়েই মূলত সমাপ্তি ঘটে মধ্যযুগের। সূচনা হয় বাংলা সাহিত্যের এক বন্ধ্যাযুগের, সৈয়দ আলী আহসানের ভাষায় যাকে বলা যেতে পারে ‘প্রায় শূন্যতার যুগ’।

ভারতচন্দ্রের কিছু রচনা

ভারতচন্দ্র রায়ের প্রথম রচনা ‘সত্যনারায়ণের পাঁচালি’। এই কবিতার মধ্য দিয়ে তিনি কবি হিসেবে সমাদর লাভ করেন। কবিতার ফারসি ও উর্দু শব্দের সাবলীল ব্যবহার তাঁকে বিশিষ্টতা দান করেছে।

‘অন্নদামঙ্গল’ কবির শ্রেষ্ঠ কীর্তি হিসেবে স্বীকৃত। আমরা সবাই এ কাব্যের জন্যই তাঁকে চিনি। অন্নদামঙ্গল মূলত একটি মঙ্গলকাব্য। নবদ্বীপ ও কৃষ্ণনগরের রাজা মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে তিনি এই কাব্যটি রচনা করেন। ‘অন্নদামঙ্গল’ কাব্যের আরেক নাম ‘অন্নরূপমঙ্গল’। এই কাব্যে কবি কঙ্কন মুকুন্দরামের লেখার ঢং লক্ষ্য করা যায়। মূলত, কৃষ্ণচন্দ্রই চেয়েছিলেন মুকুন্দরামের মতো করে একটি কাব্য লিখে দিতে।

অন্নদামঙ্গল কাব্যটির প্রধান চরিত্র ‘ঈশ্বরী পাটনী’। ঈশ্বরী পাটনীর মুখে উচ্চারিত সেই প্রার্থনাটি তো প্রতিটি বাঙালি পিতা-মাতার চিরন্তন প্রার্থনা-

> "আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে।"

অন্নদামঙ্গল কাব্যটি অষ্টাদশ শতকের শ্রেষ্ঠতম কাব্য। প্রতিটি মঙ্গলকাব্যেই কোনো না কোনো দেবীর মাহাত্ম্য গীত হয়। যেমন, ‘মনসামঙ্গল’ কাব্যে সাপের দেবী মনসা ও ‘চণ্ডীমঙ্গল’ কাব্যে দেবী চণ্ডীর কাহিনী বিধৃত হয়েছে।

অনুরূপভাবে, অন্নদামঙ্গল কাব্যেও একজন দেবীর গুণকীর্তন করা হয়েছে, আর তিনি হচ্ছেন দেবী অন্নপূর্ণা। নবদ্বীপ তথা বর্তমান নদীয়ার রাজা বাংলা অঞ্চলে সর্বপ্রথম এই অন্নপূর্ণা দেবীর পূজা প্রথা প্রচলন করেন। সেই পূজা অর্চনা উপলক্ষেই রাজার আদেশে ভারতচন্দ্র এই মঙ্গলকাব্যটি রচনা করেন ১৭৫২ খ্রিস্টাব্দে।

প্রখ্যাত গবেষক অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে,

> "অন্নদামঙ্গলকাব্য অষ্টাদশ শতাব্দীর সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্য, সমগ্র বাংলা সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের অন্যতম। ... মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র কর্তৃক অন্নপূর্ণা পূজা উপলক্ষ্যে মহারাজের নিজ কীর্তি এবং তাঁহার পূর্বপুরুষ ভবানন্দ মজুমদারের রাজ্য ও রাজা উপাধি লাভের কাহিনী বর্ণনাই ছিল কবির প্রধান উদ্দেশ্য। দেবী অন্নদা (অন্নপূর্ণা) কীভাবে ভবানন্দ মজুমদারকে কৃপা করিলেন, এবং ভবানন্দ কীভাবে জাহাঙ্গীরের দ্বারা অন্নপূর্ণা পূজা করাইয়া রাজত্ব ও রাজা খেতাব লাভ করিলেন– ইহার বর্ণনাই ছিল কবির প্রচ্ছন্ন উদ্দেশ্য। কিন্তু কবি পৌরাণিক অংশবিশেষ ফলাও করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।"

অন্নদামঙ্গল কাব্যের রয়েছে তিনটি খণ্ড:

(ক) অন্নদামঙ্গল বা অন্নদামাহাত্ম্য,

(খ) বিদ্যাসুন্দর বা কালিকামঙ্গল ও

(গ) মানসিংহ বা অন্নপূর্ণামঙ্গল।

প্রথম খণ্ডে দেখতে পাই, সতীর সঙ্গে শিবের বিবাহ এবং তাঁর পিতা দক্ষ কর্তৃক আয়োজিত মহাযজ্ঞের ধ্বংসলীলার উপাখ্যান। দ্বিতীয় খণ্ডে আছে মূলত কালকেতু এবং তার উপাসনার মধ্য দিয়ে দেবী অন্নদার পৃথিবীতে আবির্ভাবের উপাখ্যান। তৃতীয় ও শেষ খণ্ডে, বর্ধমানের রাজকন্যা বিদ্যা এবং যুবরাজ সুন্দরের কলঙ্কজনক অবৈধ প্রণয়-উপাখ্যান। এই উপাখ্যানটি অবশ্য কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে পরে রচিত হয়। তবে, ভারতচন্দ্র তাঁর প্রতিভা দ্বারা খণ্ড তিনটিকে খুব সুন্দরভাবে মিলিয়ে পুরো কাব্যে এক অখণ্ড আবেশ সৃষ্টিতে সমর্থ হন।

কবি ভারতচন্দ্র তাঁর জীবনের এই শ্রেষ্ঠ কীর্তিকে নিজেই ‘নূতন মঙ্গল’ আখ্যা দিয়েছেন। কেননা, বস্তুতই কাব্যটিতে নূতনত্ব রয়েছে। মঙ্গলকাব্য হিসেবে প্রচলিত ধারাকে অনুসরণ করলেও এর বিষয়বস্তু বা আখ্যানভাগে রয়েছে অভিনবত্ব। এখানে, অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের মতো গ্রামীণ পরিবেশের কাহিনী বর্ণিত হয়নি, বরং রাজসভার ঘটনাবলী এতে প্রাধান্য পেয়েছে। ‘মনসামঙ্গল’ ও ‘চন্ডীমঙ্গল’ লৌকিকাশ্রয়ী হলেও ‘অন্নদামঙ্গল’ কাব্যের কাহিনী পৌরাণিক গল্পাশ্রয়ী। অন্যান্য মঙ্গলকাব্য যেখানে স্বপ্নে পাওয়া দেবীর কথিত আদেশে রচিত হয়েছিলো, সেখানে এই কাব্যটি কবি রচনা করেছেন মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে।

এতদসত্ত্বেও, কবি ভারতচন্দ্রের কাব্যনৈপুণ্যগুণে ‘অন্নদামঙ্গল’ কাব্যটি মঙ্গলকাব্যের প্রধান ধারা হিসেবে স্বীকৃত। অন্নদামঙ্গল কাব্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য,

"রাজসভাকবি রায়গুণাকরের অন্নদামঙ্গল-গান রাজকণ্ঠের মণিমালার মতো, যেমন তাহার উজ্জ্বলতা তেমনি তাহার কারুকার্য।"

ভারতচন্দ্রের অন্যান্য রচনা

ভারতচন্দ্রের আরো কিছু গৌণ রচনা রয়েছে। সত্যপীরের পাঁচালি বা সত্যনারায়ণের পাঁচালির কথা আগেই বলেছি। এছাড়া, তাঁর একটি অনুবাদ কাব্য হচ্ছে ‘রসমঞ্জরী’। এটি মিথিলার ভানু দত্তের একটি কাব্যের অনুবাদ। ভারতচন্দ্রের দুটি দীর্ঘ কবিতা রয়েছে, ‘গঙ্গাষ্টক’ ও ‘নাগাষ্টক’। গঙ্গাষ্টক একটি সংস্কৃতপ্রধান কাব্য। অপরদিকে, নাগাষ্টক কাব্যটি রচিত হয়েছে মহারাজার ইজারাদার রামদেবের প্রশস্তি গেয়ে। এতে সংস্কৃত ও বাংলার মিশ্রণ আছে। ফারসি ও হিন্দুস্থানীয় ভাষায় ব্যাপক পারদর্শী ভারতচন্দ্র এই দুই ভাষার শব্দ ব্যবহার করেও অনেক কাব্য রচনা করেছেন। কোনো কোনো সমালোচক তাঁর রচনায় অশ্লীলতার উপস্থিতির অভিযোগ করেছেন।

ভারতচন্দ্র রায়ের সমালোচনা

নিঃসন্দেহে ভারতচন্দ্র রায় মধ্যযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। তাঁর রচনা বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে বহুগুণে। তাঁর রচনায় মুগ্ধ হয়ে মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত ভারতচন্দ্রকে বলেছেন,

"The father of a very vile school of poetry though himself a man of element genius."

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে,

"ভারতের তুল্য সুলেখক আজ পর্যন্ত এদেশে জন্ম গ্রহণ করে নাই এবং বোধহয় জন্মিবেও না; তেমন মধুমাখা কথা বুঝি আর কেহ কখনও গৌড়বাসীদের শুনাইতে পারিবে না।"

বঙ্গিমচন্দ্র তার ‘বেঙ্গলি লিটারেচার’ প্রবন্ধে ভারতচন্দ্রকে ‘ফাদার অব দ্য মডার্ন বেঙ্গলি’ বলেছেন। তবে ক্ষেত্রবিশেষে বঙ্কিম তাঁর সমালোচনাও করেছেন। আবার 'কমলাকান্তের দপ্তর' এ তীর্যক ভঙ্গিতে লিখেছেন,

"ভারতচন্দ্র আদি রস পঞ্চমে ধরিয়া জিতিয়া গিয়াছেন- কবিকঙ্কণের ঋবভস্বর কে শুনে?"

-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভারতচন্দ্রের রচনার একজন গুণগ্রাহী। তিনি ভারতচন্দ্র ও তাঁর রচনা সম্বন্ধে খুব ইতিবাচক মনোভাব রাখতেন। সে প্রসঙ্গে কবিগুরুর একটি বিখ্যাত উক্তি আগেই উল্লেখ করেছি। তবে, কবিগুরু কিন্তু তাঁকে আবার সমালোচনাও করেছেন অন্যত্র, বিদ্যাসুন্দরের কবি সমাজের বিরুদ্ধে যথার্থ অপরাধী।

কবি হিসেবে নিঃসন্দেহে ভারতচন্দ্র মেধাবী ও শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার। তবে, তাঁর কাব্যে কোনো কোনো জায়গায় মাত্রাতিরিক্ত রাজবন্দনা তাঁর কবিত্বের সাথে বেমানান। সে হিসেবে ভারতচন্দ্র সমালোচকদের সুনাম ও দুর্নাম দুটোই কুড়িয়েছেন।

ভারতচন্দ্রের রচনার কিছু বিখ্যাত বচন

কবি ভারতচন্দ্র রায় তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা ‘অন্নদামঙ্গল’ কাব্যে এমন অনেক অমৃত বাণী উচ্চারণ করেছেন, যা আজও আমাদের দৈনন্দিন কথাবার্তায় প্রবাদ প্রবচনের মতো ব্যবহৃত হয়। এ রকম কিছু বাণী বা উক্তি হলো,

- ‘জন্মভূমি জননী স্বর্গের গরিয়সী’
- ‘আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে’,
- ‘নগর পুড়িলে কি দেবালয় এড়ায়’,
- ‘মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন’,
- ‘বড়র পিরীতি বালির বাঁধ/ ক্ষণে হাতে দড়ি ক্ষণেকে চাঁদ’,

- ‘অতি বড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ/ কোন গুণ নাই তার কপালে আগুন’,
- ‘না রবে প্রাসাদ গুণ না হবে রসাল/ অতএব কহি ভাষা যাবনী মিশাল’

এরকম আরো অনেক দার্শনিক ভাবগুণসম্পন্ন প্রবাদ-প্রবচনের মর্যাদাসম্পন্ন উক্তি, বাণী উপহার দিয়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে অমর হয়ে আছেন কবি ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর। ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর বাংলা সাহিত্যের একজন পুরোধা ব্যক্তিত্ব। উত্থান-পতনের দোলাচলে জীবন পার করেছেন তিনি। জমি সংক্রান্ত বিরোধকে কেন্দ্র করে এককালের জমিদার পুত্র ছোটবেলায় হন দেশ ছাড়া, আবার পরবর্তী জীবনে এই জমি সংক্রান্ত ব্যাপারে ভোগ করে কারারুদ্ধ জীবন। সংসার জীবন ছেড়ে সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ আবার রাজ-কৃপায় নতুন জীবন। আসলেই, ভারতচন্দ্রের জীবন বড় বর্ণাঢ্যময়। এই কবির অনবদ্য রচনা ‘অন্নদামঙ্গল’ বাংলা সাহিত্যের এক অমর সৃষ্টি। পরিশেষে বড় পরিতাপের সাথে বলতে হয়, এই মহান কবি সম্বন্ধে আমরা খুব কম পাঠকই অবহিত। ভারতচন্দ্র ও তাঁর সাহিত্যকর্মকে জানার মধ্য দিয়ে আমরা আবিষ্কার করতে পারবো আমাদের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসকে।

তথ্যসূত্র : ইন্টারনেট